The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 283-299, ISSN 2306-3920

উপভাষা কেন্দ্রিক স্থানিক সম্পর্ক: একটি এথনোগ্রাফিক পর্যালোচনা

ইশিতা আখতার*
মোঃ ফজল হক**

[**সার-সংক্ষেপ :** দুইটি ভিন্ন কমিউনিটি পাশাপাশি বসবাস করার কারণে তাদের মধ্যকার সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর মধ্যে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মিশ্রণ হয়ে যায়। আবার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য কমিউনিটিগুলো দীর্ঘদিন বসবাস করার পরও তাদের মধ্যে উপভাষাগত পার্থক্যের পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর মধ্যে কিছু কিছু ট্রেইটের বিনিময় হয় না। এ প্রায় অবিনিময়কৃত ট্রেইটের কারণে পাশাপাশি বসবাসরত একাধিক কমিউনিটির জনগোষ্ঠীগুলো তাদের স্বতন্ত্র অবস্থান এবং পরিচিতি নিয়ে টিকে থাকতে পারে। এ ট্রেইট গুলোর ভিন্নতার কারণেই তাদের মধ্যে সম্পর্কের নৈকট্য ও দুরত্ব তৈরী হয়। আমাদের এ গবেষণায় আমরা দুইটি উপভাষিক কমিউনিটির জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন পাশাপাশি অবস্থান করার কারণে তাদের মধ্যে কোন কোন ট্রেইটের বিনিময় হয়েছে এবং কোন কোন ট্রেইট এখনও স্বাতন্ত্র্য ধরে রেখেছে সে বিষয়গুলো অনুসন্ধান চালিয়েছিলাম। গবেষিত এলাকায় ভাটিয়া ও বাঙালি নামে দুইটি কমিউনিটি বাস করে। এ কমিউনিটি দুইটির মধ্যে একটি ছিল অভিবাসিত কমিউনিটি যারা ভাটিয়া নামে পরিচিত এবং এ গবেষিত এলাকায় প্রায় ৬০ বছরের অধিক সময় ধরে বাঙালি কমিউনিটির (যারা এ গবেষিত এলাকায় স্থানীয় হিসেবে পরিচিত) পাশাপাশি অবস্থান করছেন। উক্ত জনগোষ্ঠী দুটির মধ্যে ব্যবহৃত ভাষার কিছু কিছু শব্দে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে এবং সেই সাথে একই শব্দ উচ্চারণে কণ্ঠস্বরের ওঠানামায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানে অভিবাসন বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহৃত উপভাষাকে নিয়ামক ধরে উভয় কমিউনিটির অন্যান্য যে বৈশিষ্ট্যগুলো মিশ্রিত হয়ে গেছে আবার কিছু বৈশিষ্ট্য যেগুলো এখনও অমিশ্রিত অবস্থায় রয়েছে তা এ গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। মূলত এ গবেষণার মূল বিষয় হচ্ছে অভিবাসিত হয়ে পাশাপাশি বসবাসরত দুইটি উপভাষিক কমিউনিটির মধ্যকার কিছু ট্রেইটের আন্ত বিনিময় এবং স্বতন্ত্রতা অনুসন্ধান।]

ভূমিকা

ভাষা মানুষের ভাবকে বাস্তবতায় রূপ দেয়। ভাষার মধ্য দিয়েই মানুষ পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। ভাষার কথ্য ও লেখ্য দুইটি রূপ বিদ্যমান। স্থানভেদে কথ্য ভাষার ভিন্নতা লক্ষ করা

---

* **ইশিতা আখতার :** সহকারী অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

** **মোঃ ফজল হক :** মুক্ত গবেষক ও ব্যাংকার।

যায়। এ ভিন্নতা ধরা পড়ে উচ্চারণ ভঙ্গি, শব্দের অর্থের ব্যবহার ও কথা বলার স্বরে (কণ্ঠ স্বরের উঠা নামা)। তবে একই ভাষার আধিকারী বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যেও পার্থক্যটি লক্ষ করা যায়। অঞ্চলভিত্তিক একই ভাষার এই ভিন্নতাকে ভাষাবিজ্ঞানে উপভাষা হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ উপভাষা ভিত্তিক আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে শুধু ভাষাগত পার্থক্যই লক্ষ করা যায় না সেসাথে এক উপভাষিক জনগোষ্ঠীর সাথে অন্য একটি উপভাষিক জনগোষ্ঠীর মধ্যকার আচার-আচরণ, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, চালচলন, বিশ্বাস, সামাজিক সম্পর্ক ও এর সাথে জড়িত সামাজিক কর্মকাণ্ড, তাদের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা এবং আরও অনেক বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। আবার একাধিক উপভাষিক জনগোষ্ঠী দীর্ঘ দিন পাশাপাশি অবস্থানের কারণে তাদের এসব বিষয়গুলোর মধ্যে মিশ্রতা দেখা যায়, আবার কিছু কিছু বিষয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে মিশ্রতাকে পাশ কাটিয়ে টিকে থাকে। দুইটি উপভাষা গোষ্ঠীর সীমান্ত অঞ্চলের লোকজনের মধ্যে এ ধরনের মিশ্রতা পরিলক্ষিত হয়। তবে সব মিশ্রণ কে উপেক্ষা করে ভাষার আঞ্চলিকতা এবং কথা বলার স্বরেও স্থিতাবস্থা থেকেই যায়। আমাদের দেশে এ আঞ্চলিকতাকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র পরিসরে নানান 'ইজমের' (ism) উপস্থিতি (যেমন নোয়াখাইল্লা, ঢাকাইয়া, রংপুরিয়া প্রভৃতি) পরিলক্ষিত হয়। যেমনটা ধর্ম ভিত্তিক ইজম এর উপস্থিতিতে দেখা যায়। এ ইজম এর আর্বিভাব ঘটে নিজ এলাকার বাইরে অন্য কোন এলাকায় যখন কোন ব্যক্তি তার আঞ্চলিক মাতৃভাষা ব্যবহার করেন তখন।

একাধিক আঞ্চলিক বা উপভাষিক জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্কের এ নৈকট্য ও দূরত্বকে পরীক্ষা করার জন্য নীলফামারী জেলার ডিমলা থানার নাউতারা ইউনিয়নের আকাশকুড়ী গ্রামে একটি গবেষণা চালিয়েছি। এখানে পাশাপাশি দুটি উপভাষিক জনগোষ্ঠীর বাস করে। এখানে একটি জনগোষ্ঠী এ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বাস করে আসছে যাদেরকে এ এলাকার স্থানীয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তারা উভয় কমিউনিটিতে 'বাঙালি' হিসেবে এবং অন্য একটি জনগোষ্ঠী বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে মানিকগঞ্জ, ঢাকা, টাংগাইল, ময়মনসিংহ থেকে এখানে জীবিকার তাগিদে অভিবাসন করে এসেছেন তাদেরকে 'ভাটিয়া' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। দীর্ঘদিন কাছাকাছি এবং পরস্পরের সংস্পর্শে বসবাস করার কারণে তাদের মধ্যকার যে সাংস্কৃতিক ট্রেইটের বিনিময়, স্বাতন্ত্র্য বা ইজম এর উদ্ভব হয়েছে তার স্বরূপ আমাদের প্রবন্ধে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছি। আমাদের এ প্রবন্ধের নির্যাসে রয়েছে অভিবাসনের কারণে কাছাকাছি বসবাসরত দুটি ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যকার ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং দীর্ঘদিন পাশাপাশি সহাবস্থানের কারণে এ পরিসরগুলোর ট্রেইটের পারস্পারিক আদান প্রদান এবং অবিকৃত কিছু ট্রেইটের স্বরূপ উন্মোচন।

সাহিত্য পর্যালোচনা

একালচারেশনের মাধ্যমে দুই বা ততোধিক সংস্কৃতি পরস্পর সহাবস্থানের ফলে এক সংস্কৃতির প্রভাবে অন্য সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদানে বা বিন্যাসে পরিবর্তন অথবা উপাদানগুলোর আদান প্রদান হয়ে থাকে। গবেষণার জন্য নির্ধারিত এলাকায় দুইটি উপভাষিক কমিউনিটি দীর্ঘদিন পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে একটি সংস্কৃতির দ্বারা অন্য সংস্কৃতির লোকজনের অভ্যাস, খাওয়া-দাওয়া, আচার-আচরণ, উপভাষার শব্দগত আদান প্রদান, বিবাহ ব্যবস্থায় পরিবর্তন, পোশাকে পরিবর্তন হয়েছে এবং কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে রয়ে গেছে তার কোন পরিবর্তন হয়নি যেমন- উপভাষার উচ্চারণে, বাড়িঘরের বিন্যাসে, কিছু সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে, খাওয়া দাওয়ায়, কিছু বিশেষচর্চার ক্ষেত্রেও এ স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। প্রবন্ধে তাদের উপভাষিক স্বাতন্ত্র্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। এ Acculturation এর কারণেও তারা কীভাবে একে অপর থেকে আলাদা হিসেবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করে তা দেখানোও ছিল আমাদের গবেষণার তাত্ত্বিক অবস্থান। Franz Boas (1940, 211-218, 290-294) Cultural Hybridization এবং Diffusionism ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখেন দুইটি সামাজিক দল যখন

কাছাকাছি বসবাস করে এবং তাদের মধ্যে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ হয় তখন তাদের মধ্যকার সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো একে অপরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে ভাষার গঠনগত পরিবর্তন (morphological), শব্দভাণ্ডারে ও অভিধানে (lexicografical) পরিবর্তন, শব্দের মধ্যে পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও বিস্তরণ (Diffussion) ঘটে। তিনি তার গবেষণাপত্রে দেখান যে সব গোষ্ঠী পরস্পর থেকে দূওে বাস করে তার চেয়ে পরস্পর কাছাকাছি বাসকারী কিছু কিছু আমেরিকান ইন্ডিয়ান 'ট্রাইব'দের সাংস্কৃতিক উপাদান ছিল অধিকতর সমরূপ।

প্রবন্ধে ভাটিয়া ও বাঙালি উপভাষিক কমিউনিটির জনগোষ্ঠী দীর্ঘ দিন কাছাকাছি বাস করার ফলে তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক উপাদানের (traits) বিনিময় হয়েছে। আবার কিছু কিছু উপাদানের বিনিময় হয় নি যেমন- শব্দের উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্বরের যে উঠানামা, এ ক্ষেত্রে বাঙালি উপভাষিক একজন ব্যক্তি ভাটিয়া উপভাষিক কোন ব্যক্তির সাথে কথা বললে তাকে ভাটিয়াদের মত মনে হয় না। বোয়াস দেখান ইন্ডিয়ান ভাষার কোয়াকিউটল ইন্ডিয়ানরা এবং আমেরিকান ইংরেজি ভাষার জনগোষ্ঠী পাশাপাশি বাস করার ফলে তাদের মধ্যকার যোগাযোগ তাদের ভাষার শব্দ ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির মধ্যে আদান-প্রদান ঘটেছে।

বোয়াসের কাজের সাথে আমাদের কাজের মিল থাকা সত্ত্বেও যে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে কাজটি করেছি সেটি হল- দুইটি উপভাষিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাগত কিছু ভিন্নতার কারণে আর কী কী বিষয় তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র হিসেবে বিরাজ করে তা দেখা।

M.K. Verma সম্পাদিত Sociolinguistics Language and Society (1998, 63-72) তে দেখান যে, ভাষা সম্প্রদায় ও সমাজ একে অপরকে প্রভাবিত করে। এ বইতে প্রকাশিত Heinrich Ramisch এর Linguistic Variation in Guernsey English প্রবন্ধে দেখান, কীভাবে প্রতিবেশী ভাষার সাথে মূল ভাষার বিনিময় হয় এবং একটি নতুন রূপ লাভ করে। তারা যোগাযোগের ক্ষেত্রে একে অপরের ভাষা ও সংস্কৃতির অন্যান্য উপাদান এবং আচার-আচরণকে শেয়ার করে। তিনি এতে আরও দেখান যে, Norman France উপভাষিক জনগোষ্ঠী দোভাষী হয়, যদিও তারা মূলত ইংরেজি ভাষিক জনগোষ্ঠী। তিনি দেখতে পান প্রায় ৫০ ভাগ লোক প্রতিদিন ইংরেজি ভাষায় কথা বলেন। প্রায় ৩০ বছরের নিচের বয়সী লোকজন তাদের উপভাষাকে ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে। তারা এ ভাষা তাদের পরিবার, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীদের সাথে ব্যবহার করে যারা কি না এ ভাষা বুঝতে পারেন। আর অপরিচিত Norman Islander-দের সাথে তারা সেখানকার স্থানীয় ভাষায় কথা বলে। তবে বিশেষ করে বৃদ্ধ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার দৈনন্দিন কথাবার্তা তাদের নিজ ভাষাতেই হয়। তিনি এ ধরনের উপভাষার বা কথোপকথনের বিচ্যুতির কারণ হিসেবে সামাজিক মর্যাদাকে দায়ী করেন। কিন্তু এ গবেষণায় দেখতে পেয়েছি যে, সামাজিক মর্যাদার পাশাপাশি যোগাযোগ সহজ করার জন্য এ ধরনের বিচ্যুতি হয়। এক্ষেত্রে বাঙালি উপভাষিক কমিউনিটির লোকজন ভাটিয়াদের সাথে কথা বলার সময় ভাটিয়া ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে থাকে যদিও তাদের গলার স্বরে বাঙালি টান থেকে যায়। আবার ভাটিয়ারা বাঙালিদের সাথে কথা বলার সময় বাঙালিদের মতো করে কথা বলার চেষ্টা করে থাকে। সামাজিক মর্যাদা উচ্চে থাকলেও এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তবে শিক্ষিত শ্রেণির মাঝে এ ধরনের আঞ্চলিক টান থাকে না। যদি শিক্ষিত ভাটিয়া ব্যক্তি অথবা বাঙালি ব্যক্তি অন্যদের সাথে কথা বলে তাহলে সে চলিত ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে তবে ক্ষেত্র বিশেষে (বন্ধু-বান্ধব, পরিবারের সদস্য) আঞ্চলিক টান এসে যায়।

Dell Hymes সম্পাদিত *Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and Anthropology* (1964,511-520) এ Edward P. Dozier রচিত Two Examples of Linguistic Acculturation:The Yaqui of Sonora and Arizona and the Tewa of New Mexico- প্রবন্ধে দেখান Sonora এবং Arizona-র Yaqui-রা স্প্যানিশদের পাশাপাশি বসবাস করার কারণে

স্প্যানিশদের প্রভাবে Yaqui-দের ভাষার ধ্বনি/শব্দের গঠন ও তাদের বাক্যের গঠনেও পরিবর্তন হয়েছে। তিনি New Mexico বা Spanish Tewa-দের ভাষার উপর স্প্যানিশদের আধিপত্যকে দেখিয়েছেন। তিনি দেখতে পান যখন কোন Tewa তাদের নিজেদের মধ্যে কথা বলে তখন তারা তাদের উপভাষায় কথা বলে এবং মাঝেমধ্যে Spanish ভাষা থেকে ধার করা শব্দও ব্যবহার করে। কিন্তু যখন তার কাছাকাছি কোন স্প্যানিশ কিংবা কোন স্প্যানিশ শিশু উপস্থিত থাকে যিনি কিনা মোটামুটি স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে পারে তাহলে ঐ Tewa লোক স্প্যানিশ কোন শব্দ ব্যবহার করে না। এর কারণ Tewa-দের উপর স্প্যানিশ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আছে। এজন্য তারা স্প্যানিশদের উপস্থিতিতে স্প্যানিশ ভাষা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে।

Dozier এর প্রবন্ধের আলোচনার সাথে আমাদের প্রবন্ধ প্রাসঙ্গিক এ কারণে যে, এখানে একটি ভাষার জনগোষ্ঠীর উপর অন্য ভাষার জনগোষ্ঠীর প্রভাব দেখানো হয়েছে। কিন্তু এ গবেষণার সাথে আমার গবেষণার মৌলিক পার্থক্য হল- Dozier দেখান স্প্যানিশদের প্রভাবে Tewa-দের কিছু ধার করা শব্দকে ব্যবহার করা গোপন রাখে কিন্তু আমাদের গবেষিত এলাকায় ভাটিয়া ও বাঙালিদের মধ্যে আমি যে বিষয়টি লক্ষ্য করেছি সেটি হল ভাটিয়ারা বাঙালিদের সাথে কথা বলার সময় তাদের ধার করা শব্দকে গোপন না করে বরং তাদের (বাঙালি) ভাষার মাধ্যমেই কথা বলার চেষ্টা করে। আবার বাঙালিরাও ভাটিয়াদের সাথে কথা বলার সময় ভাটিয়াদের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে।

Barth (1969,117-134) Ethnic Groups And Boundaries: The Social Organization of Cultural Difference গ্রন্থে সীমান্তে বাস করা পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের বেলুচ ও পাঠানদের দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করার ফলে তাদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক উপাদনের মিশ্রণ ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে তা তুলে ধরেন। পাঠানদের দৃষ্টিতে তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি চর্চার কারণেই তাদের একক আত্মপরিচয় গঠন সম্ভব হয়েছে। এই স্বতন্ত্র চর্চা গুলোর মধ্যে আছে যে, তারা বিশ্বাস করে একই ধর্মের(ইসলাম ধর্মের) একজন সাধারণ পূর্বসূরী থেকে তাদের পিতৃতান্ত্রিক বংশের শুরু হয়েছে, তাদের রয়েছে একই ভাষা, সাধারণ মৌলিক সাহিত্য এবং পিতৃতান্ত্রিকতার সাথে যুক্ত একই অন্যান্য মৌলিক বিষয়াবলি। পাঠানদের এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বার্থ তার নিজের ধারণা যুক্ত করে বলেন, এই একক পরিচয়ের পেছনে তিনটি বিষয় কাজ করে যেমন-সৌহার্দ্য, সমতার জন্য সমাবেশ, এবং নারীদের স্বাতন্ত্র্য। সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা সকল পাঠানদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র পাঠান আত্মপরিচয় তৈরি হয়, যেখানে সাধারণ পূর্ব পুরুষের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বার্থ আরও দেখান পাঠানরা তাদের পার্শ্ববর্তী বেলুচদের থেকে তাদের সংগঠনের কারণে স্বতন্ত্র পরিচিতির সীমা তৈরি করতে পেরেছে।

প্রবন্ধে ভাটিয়া ও বাঙালিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক একালচারেশন হওয়ার পরও কতগুলো বিষয় যেমন, কিছু বিশেষ চর্চা যেমন- ভাটিয়াদের পির-ফকির ধারার চর্চা, ভাটিয়াদের মসজিদ ভিত্তিক সমাজিক সংগঠন, বাঙালি ও ভাটিয়াদের ব্যবহৃত উপভাষা, ভাটিয়া ও বাঙালিদের স্থানীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ (যেমন- ভাটিয়াদের মধ্য থেকে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদ ও সংরক্ষিত নারী পদে নির্বাচন ও তাদের ভোট দেওয়া) এসব চর্চা বাঙালিদের থেকে ভাটিয়াদের স্বতন্ত্র পরিচিতি দান করেছে। এ কারণেই এটি আমার এ প্রবন্ধের সাথে প্রাসঙ্গিক।

প্রত্যয়গত আলোচনা:

প্রবন্ধে ব্যবহৃত মূল এবং কেন্দ্রীয় প্রত্যয়গুলো হচ্ছে ‘সংস্কৃতি’, ‘একালচারেশন’, ‘উপভাষা’, ‘কমিউনিটি’, ‘ভাটিয়া’, ‘বাঙালি’। তাত্ত্বিক পরিসরকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এ প্রত্যয়গুলোকে কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হিসেবে আমার কাছে মনে হয়েছে। নিম্নে এ প্রত্যয়গুলোর সংজ্ঞা এবং এগুলো কোন তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা উপস্থাপন হল-

সংস্কৃতি

'সংস্কৃতি' শব্দটির সাথে আমরা প্রায় সবাই পরিচিত। এ পরিচিত প্রত্যয় 'সংস্কৃতি' বলতে আমরা যা বুঝি তা হল- সমাজের সদস্য হিসেবে একজন মানুষ যা করে থাকে তাকে। বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী সংস্কৃতির সংজ্ঞায়ন করেছেন। এদের মধ্যে এডওয়ার্ড বার্নেট টাইলর(১৮৩২-১৯১৭) তার বিখ্যাত বই, 'প্রিমিটিভ কালচার' এ প্রথমবারের মত সংস্কৃতির নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞা প্রদান করেন। তিনি বলেন বৃহত্তর জাতিতাত্তিক দৃষ্টিতে সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জিত আচার-আচরণ,ব্যবহার, জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতি-প্রথা, আইন ইত্যাদির সমাবেশ যা একজন মানুষ সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জন করে, তাই হল সংস্কৃতি বা সভ্যতা। R.W. Casson(1981,42-66) সম্পাদিত Language Culture And Cognition নামক বইতে Roger M. Keesing (1981,42-66) এর রচিত অনুচ্ছেদ 'Theories Of Culture' এ সংস্কৃতিকে একটি অভিযোজন প্রক্রিয়া ও এর ফল হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন। তার মতে, "প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে টিকে থাকার ক্ষেত্রে একজন মানুষ যেসব আচরণ প্রদর্শন করে থাকে তার সমষ্টিই হল সংস্কৃতি।" Clifford Geertz এবং David Schneider এর মতে, "সংস্কৃতি হল প্রতীক এবং এর অর্থের সমন্বয়ে গঠিত একটি সমন্বিত ব্যবস্থা।"

একালচারেশন

একালচারেশন (Acculturation) শব্দটি ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে কোন সংস্কৃতির যোগাযোগের মধ্যে যে Accomodation ও Change হয় তার প্রক্রিয়াকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। ১৯৩০ এর দশকে এ প্রত্যয়টি আমেরিকান নৃবিজ্ঞানীদের দ্বারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। Mcmillan Dictionary Of Anthropology তে বলা হয়েছে- Acculturation হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় একাধিক সংস্কৃতি পাশাপাশি অবস্থান করে এবং তাদের লোকজনের মধ্যে যোগাযোগের কারণে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসে পরিবর্তন আসে এবং একে অপরের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে।

Dell Hymes সম্পাদিত Language In Culture And Society (1964,518) গ্রন্থে ভাষার একালচারেশন বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে পাশাপাশি দুইটি আঞ্চলিক ভাষাগোষ্ঠীর বসবাসের কারণে তাদের মধ্যকার শব্দের আদান প্রদান হয়েছে এবং এ ভাষা দুইটির মধ্যে কিছু সাধারণ শব্দ তৈরী হয়ে গেছে যা পূর্বে একটি ভাষায় ব্যবহৃত হতো। এর পাশাপাশি তিনি সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানকেও ভালভাবে তুলে ধরেন। আমি আমার গবেষণায় দুইটি উপভাষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক একালচারেশনকে দেখবার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছি।

উপভাষা

ইংরেজীতে ব্যবহৃত 'Dialect' শব্দটির বাংলায় ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ হলো 'উপভাষা'। Dialect এর মূল গ্রিক 'Dialectos'। ব্যুৎপত্তি দেখানো হয় এভাবে Greek, dia'lectos (dia-between + legein speak)>latin. Dialectusm > French. Dialecte > English, dialect. বলা হয়েছে যে, গ্রিক শব্দটি Discourse, Way of talking, Language of a country এবং ইংরেজিতে Mode of speech, Manner of speaking অর্থে প্রযুক্ত হয় (The century Dictionary-1889: v-4 এবং দানিউল: ২০০৮)। এর দ্বারা ভাষার রকমফের বোঝাতো।

প্রত্যেক ভাষার এক বা একাধিক আঞ্চলিক রূপ থাকে। মূল ভাষার সাথে সাদৃশ্যমূলক (অর্থাৎ মূল ভাষার কাছাকাছি) এরকম আঞ্চলিক ভাষা রূপকে সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা। তবে আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে, মূল ভাষার কাছাকাছি অথবা মূলভাষাকে আশ্রয় করে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে যদি কোনো ভাষা রূপ প্রচলিত থাকে তাকেই উপভাষা বলা যায়।

আধুনিক ভাষাতত্ত্ব গ্রন্থের লেখক ড. আ. কা. মনজুর মোর্শেদের মতে, "উপভাষা হচ্ছে চলিত ভাষার একটি উপরূপ। ভাষা বিজ্ঞানী অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের মতে, ভাষা ও উপভাষা আসলে শব্দগত ভেদ, অবস্থা, পরিবেশ বা প্রসঙ্গ অনুযায়ী এর ব্যবহার ভেদ ঘটে(দানিউল: ২০০৮, ৩৫৫)। আমাদের দেশেও বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলা ভাষার উপভাষা রয়েছে। উপভাষাগুলোর শব্দগত ভেদ প্রায় মূল ভাষার কাছাকাছি। যেমন - নোয়াখালী ও পুরান ঢাকার ভাষার মধ্যে স্বরের বা উচ্চারণে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু এ দুটি ভাষাই বাংলার মূল ধারার কাছাকাছি।

কমিউনিটি

নৃবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানে কমিউনিটি বা সম্প্রদায় শব্দটি বিস্তর অর্থ বহন করে। বৃহৎ অর্থে কমিউনিটি শব্দটি একদল লোককে বোঝায় যারা একক কোনো আগ্রহ বা বিষয়কে কেন্দ্র করে একীভূত (সমন্বিত) অবস্থায় বসবাস করে। এক্ষেত্রে একটি পেশাজীবি দল, কোন আবাসিক এলাকার লোকজন, (কোনো গ্রাম অথবা শহরের অধিবাসী অথবা কোনো সেক্টরের লোকজন) কোনো ক্লাব বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে কমিউনিটি হিসেবে ভাবা যেতে পারে। (Mcmillan Dictionary of Anthropology, 1986, 46)

Barnard and Spencer (1996,114-116) দেখান বিগত ২০০ বছরে কমিউনিটি প্রত্যয়টি সামাজিকবিজ্ঞানে বহুল আলোচিত একটি প্রত্যয়। Robert (1949) কমিউনিটির চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন- সামাজিকভাবে ছোট স্কেল হবে, কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক (homogeneity) কর্মকাণ্ড ও মনোভাব থাকবে, বৈচিত্র্যহীন সচেতনতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ চাহিদা থাকবে।

এ প্রবন্ধে ভাটিয়া ও বাঙালি জনগোষ্ঠীকে আমরা কোনো এথনিক গোষ্ঠী না বলে তাদেরকে কমিউনিটি হিসেবে আখ্যায়িত করার পক্ষপাতী। এখানে তাদের দলীয় আকৃতি তেমন বড় নয়, তাদের ভাষাও আলাদা নয়, তাদের ভাষা মূলভাষা বাংলার কাছাকাছি দুইটি উপভাষা ভাটিয়া ও বাঙালি। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরনের হোমোজেনেটি লক্ষ করেছি।

ভাটিয়া

'ভাটিয়া' শব্দটি ভাটি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যার আভিধানিক অর্থ নদীর স্রোত যে দিকে যায় সে দিক। 'ভাটিয়া' শব্দটি দ্বারা সাধারণত ভাটি অঞ্চলের লোকজনকে বোঝায়। বৃহত্তর রংপুর জেলায় এ শব্দটি রংপুর অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত সকল অধিবাসীকে বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। নীলফামারী, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা জেলায় ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর প্রচুর পরিমাণে টাংগাইল, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ জেলা থেকে লোকজন অভিবাসিত হতে থাকে এবং এসব জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এ অভিবাসী লোকজকে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের স্থানীয় লোকজন 'ভাটিয়া' হিসেবে অভিহিত করে থাকে। এসব অভিবাসীদের আঞ্চলিক ভাষাকে ভাটিয়া ভাষা বলা হয়। ভাটিয়া ভাষা এ জন্য এ এলাকায় বাংলার একটি উপভাষা হিসেবে পরিচিতি পায়। এখানে ভাটিয়া বলতে এ অভিবাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে।

বাঙালি

'বাঙালি' বলতে সাধারণত যাদের মাতৃভাষা বাংলা তাদেরকে বোঝায়। কিন্তু এ গবেষণা প্রবন্ধে বাঙালি প্রত্যয়টি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নীলফামারীর ডিমলা থানায় যারা ৪৭ এর দেশবিভাগের সময় এবং এর কিছু পরে অভিবাসিত হয়েছেন তাদের দৃষ্টিতে এ এলাকার স্থানীয়রা হলেন বাঙালি। অভিবাসীরা স্থানীয়দেরকে বাঙালি বা বাঙ্গাল এবং স্থানীয় (স্থানীয় এর অপভ্রংশীয় রূপ থানীয়া উচ্চারণ

করেন ভাটিয়ারা) বলে অভিহিত করে থাকে। এ কারণে বাঙালি শব্দটি বৃহত্তর পরিসরে বা জাতীয় পরিসরে একটি ভাষা গোষ্ঠীকে নির্দেশ করে কিন্তু গবেষিত এলাকায় এ বাঙালি শব্দটি স্থানীয়দেরকে বোঝাতে ব্যবহার করেন ভাটিয়া কমিউনিটির লোকজন। স্থানীয়রা নিজেরাও নিজেদেরকে বাঙালি এবং স্থানীয় বলে দাবি করেন।

গবেষিত ভাটিয়া এবং বাঙালি কমিউনিটির মধ্যকার সাদৃশ্য এবং স্বাতন্ত্র্য:

বিবাহ এবং স্বাতন্ত্র্য

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভাটিয়া ও বাঙালিদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বাঙালিরা পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাঙালিদের মধ্যেই পাত্র-পাত্রী খোঁজ করে এবং বিয়ের ক্ষেত্রে বাঙালি পাত্রীকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় বেশি। তবে ভাটিয়া ও বাঙালিদের মধ্যে দুটি পরিবারের সম্পর্ক যদি গভীর হয় এবং তাদের সন্তানেরা যদি আন্তঃবিয়েতে আগ্রহী থাকে তাহলে উভয় পরিবারের সদস্যদের সম্মতির পর পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিয়ে হয়।

ভাটিয়াদের ক্ষেত্রেও প্রায় একই রকম বিষয় লক্ষ করা যায়। ভাটিয়ারাও তাদের সন্তানদের বাঙালিদের কাছে বিয়ে দিতে চায় না। বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের বেলায় তারা ভাটিয়া পাত্র-পাত্রীকেই প্রাধান্য দেয়। ভাটিয়াদের মধ্যে পাত্ররা বাঙালি পাত্রীকে বিয়ে করেছে এমন সংখ্যায় খুব বেশি নেই। ১৯৪৭ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভাটিয়াদের সাথে ৮ জন বাঙালি কন্যার বিয়ে হয়েছে কিন্তু সেটিও ১৯৮০ সালের পরের ঘটনা। ভাটিয়ারা তাদের কন্যাদেরকে বাঙালিদের কাছে বিয়ে দিতে চায় না। এ প্রসঙ্গে একজন ভাটিয়া তথ্যদাতা মনোয়ারা (৬০) বলেন, "আমরা বাঙালিগো কাচে ম্যায়া বিয়া দিবার চাই না, কারণ অইচে বাঙালিরা বউ মারার সুময় কয় 'বেটি বাপ কবু না, বেটি বাপ ক' কওছে দেহি বউ কি কোন সুময় স্বামীরে বাপ কয়।"

১৯৪৭ সালের পর থেকে ৪ জন ভাটিয়া কন্যার বাঙালি ছেলের সাথে বিয়ে হয়েছে। বিয়ের ক্ষেত্রে ভাটিয়া ও বাঙালি উভয় কমিউনিটিতে পারিবারিক, আর্থিক এবং সামাজিক মর্যাদাও বিবেচনা করা হয়। পাত্র পাত্রীর পরিবার অপর পক্ষের আর্থিক অবস্থা সমমান অথবা তার চেয়ে সামান্য একটু কম বা বেশি হলে ঐ পরিবারের সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী থাকে বেশি।

আকাশকুড়ী গ্রামে বাঙালি কমিউনিটির যে ৮ জন নারীর ভাটিয়াদের সাথে বিয়ে হয়েছে তারা এখন তাদের স্বামীর পরিবারের সবার সাথে ভাটিয়া ভাষায় কথা বলে। তাদের কথা শুনলে মনে হয় না যে তারা বাঙালি ভাষিক পরিবারের সন্তান। স্থানীয়রা তাদেরকে ঠাট্টা মশকরার ছলে 'ভাটিয়ানী' (ভাটিয়ার স্ত্রী) বলেও সম্বোধন করেন। আবার ভাটিয়া নারী দুইজনও তাদের স্বামীর পরিবারের ভাষা ব্যবহার করার সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারাও অনর্গল 'বাঙালি ভাষা' ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

বিয়ের ধরনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে তেমন বড় কোন পার্থক্য চোখে পড়েনি। এখানে সাধারণত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থাকায় উভয় কমিউনিটিতে প্রায় একই ধরণের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা লক্ষ করেছি।

বিয়ের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সম্মতিতে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে দিনক্ষণ দেখে উপযুক্ত সময়ে বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। বিয়ের সময় হিসেবে অনেকে অগ্রহায়ণ মাসের ও জৈষ্ঠ্য মাসের ধান কাটার পরবর্তী মাসকে ঠিক করে থাকেন। বিয়ের নির্ধারিত তারিখের দুইদিন আগে কনের গায়ে হলুদ দেওয়া হয় এবং বরকে বিয়ের দিন গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। সাধারণত ভাটিয়া ও বাঙালি উভয় কমিউনিটির মধ্যেই রাতের বেলা বিয়ে পড়ানো হয় এবং সে সময়টা হয় রাত ১২টার পর। বিয়ের সময় খাবারের আয়োজন করা হয়। গত ২-৩ বছর আগে বর পক্ষ যখন বরযাত্রী নিয়ে কনের বাড়িতে

যেতো তখন তাদের সাথে একটি মাইক নিত পুরো রাস্তা মাইক বাজাতে বাজাতে তারা কনের বাড়িতে যেতো। কনে পক্ষের বাড়িতে মাইক আনা হতো না। বর পক্ষের মাইকের আওয়াজ শুনে কনে পক্ষের লোকজন তাদের কে বরণ করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। রাত বারোটার পর বিয়ে পড়ানো হলে বর পক্ষ কনেকে নিয়ে ঐ রাতেই তাদের বাড়িতে ফিরে আসে। বিয়ের সময় ভাটিয়া ও বাঙালি উভয় কমিউনিটিতেই গীত গাওয়া হয়, তবে এ গীতের কথা ও সুর উভয় কমিউনিটির উপভাষায় আলাদাভাবে নির্মিত। এ গীত যদি কন্যা পক্ষের কেউ গেয়ে থাকে তাহলে তাতে বর পক্ষের লোকজনকে এবং বরের বদনাম করা হয়। বর পক্ষের লোকজন যদি এ গীত গায় তাহলে কন্যার নানা রকম বানোয়াট বদনাম তুলে ধরা হয়। এ গীত গাওয়ার উদ্দেশ্য হল বিপরীত পক্ষকে ঠাট্টা মশকরা করা। এখানে বিয়ের গীত সাধারণত মহিলারা গেয়ে থাকে। ভাটিয়া কমিউনিটিতে কন্যা পক্ষের গীত সাধারণত এরকম হয়-"বইনের মত বউ পাইয়া মন বরে না রে জামাইর কান কাটা, নাক বুচা, কথা কয় না রে।"

ভাটিয়া কমিউনিটিতে বর পক্ষের গীত সাধারণত এরকম হয়-

এত দিন আছিলিরে দুবলা আলানে পালানে
এখন কেন আইলীরে দুবলা অফুলার বরনে।।
এত দিন আছিলিরে হলুদ হলুদের দুকানে
এখন কেন আইলীরে হলুদ অফুলার বরনে।।

বাঙালি কমিউনিটিতে বিয়ের সময় মহিলারা যে গীত গায় বিশেষ করে কন্যা পক্ষের, তার ধরণ নিম্নরূপ-

গাবরুর মাও তুই আয় ধীরে ধীরে
কাইনচাত আচে বিষ মানার গাচ রে
নাগেয়া দিলে যাইবে ধীরে ধীরে।

[অর্থ : যুবকের (বরের) মা তুই আয় ধীরে ধীরে, ঘরের পিছনে আছে বিষ মান কচুর গাছ, গায়ে লাগাইয়া দিলে যাবে ধীরে ধীরে]

বর পক্ষের কোন মহিলা যদি গীত গায় সেটি সাধারণত এরকম হয়ে থাকে-

ধান ধূষি কলার গেছি কান্দে না রে
ভাইয়ের মত ভাতার পেয়্যা কান্দে না রে।

বিয়ে পড়ানোর পর বরপক্ষ কনেকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসার পরের দিন বা একদিন পর কন্যা পক্ষের লোকজন আবার তাদের কন্যাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসেন। ভাটিয়া উপভাষায় এ নিয়ে আসাকে বলা হয় 'ফিরানী' এবং বাঙালি উপভাষায় বা স্থানীয় উপভাষায় এক 'আটোয়ারি' বলে। এভাবেই বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মর্যাদার ভিত্তিতে নারী ও পুরুষ

আকাশকুড়ী গ্রামে ভাটিয়া পরিবারের নারীরা খুব বেশি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন না। বিবাহিত নারীরা স্বামীর বা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ কারও অনুমতি ছাড়া বাইরে কোথাও (আত্মীয়ের বাড়িতে) যেতে পারে না। ভাটিয়া পরিবারের নারীরা অনেক বেশি পর্দাশীল। এরা পরিবারে প্রচুর পরিশ্রম করে থাকে। তারা ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত পরিবারের কাজ করে থাকে। অনেক নারী পুরুষের কাজও করে থাকে। গবেষিত এলাকায় পুব পাড়ায় হামেদ আলীর (৩৮) স্ত্রী মর্জিনা বেগমের

(৩৫) প্রচেষ্টায় ও তার খাটুনিতে যে আয় হয়েছিল তা দিয়ে হামেদ আলী একটি ধানের চাতাল দিয়েছে। সেখানে মর্জিনা বেগম সারা দিন ধান সিদ্ধ, ধান শুকানো, ধান মিলে ভাঙানোর কাজ করেন। এর পাশাপাশি পরিবারের সকল কাজ করেন। তিনি গভীর রাত পর্যন্ত চাতালের কাজে ব্যস্ত থাকেন। হামেদ আলীও তার স্ত্রীর সাথে চাতালের কাজ করেন কিন্তু তিনি পারিবারিক কাজ খুব বেশি করেন না।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা হওয়ার কারণে এখানে কোন নারী গৃহ কর্তা হওয়ার সুযোগ পায়নি। মর্জিনা বেগম তার চাতালে কাজ করেন কিন্তু এতে যে টাকা আয় হয় তা মর্জিনা বেগম নিজ হাতে খরচ করতে পারে না। মর্জিনার মত মিরাজ উদ্দিন, বদিউর রহমান, আব্বাছ আলীর বাড়িতেও ধানের চাতালের ব্যবসা আছে। এখানেও তাদের স্ত্রীরা প্রচুর পরিশ্রম করে থাকে। তবে মিরাজ উদ্দিনের স্ত্রী তুলনামূলকভাবে অন্যান্য নারীদের চেয়ে স্বাধীনতা বেশি ভোগ করে, এক্ষেত্রে তার বাবার পারিবারিক ইমেজ ও পারিবারিক প্রভাব বেশি কাজ করেছে। মিরাজ উদ্দিনের স্ত্রীর বাবা ও তার ভাই এলাকার প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তি। এ কারণেই মিরাজ উদ্দিনের স্ত্রী তার স্বামীর পরিবারে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করে। ভাটিয়া পরিবারের অবিবাহিত নারীরাও একা একা ঘুরতে যেতে পারে না এবং তাদের অভিভাবকেরাও এতে সম্মতি দেন না। মোট কথা এ কমিউনিটিতে নারীরা পরিশ্রম করে বেশি আবার স্বাধীনতাও ভোগ করে কম।

বাঙালি কমিউনিটির পরিবারগুলোতে নারীরা ভাটিয়া কমিউনিটির নারীদের চেয়ে তুলনামূলক-ভাবে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে। বাঙালি নারীরা ভোর থেকে রাত পর্যন্ত শুধু পারিবারিক কাজগুলোই বেশি করে থাকেন তবে হাতে গোনা দু' একজন নারী কৃষি কাজে তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহায়তা করে। যেমন সবজি খেত নিড়ানী দেওয়া, ধান খেতে মর্টারের সাহায্যে পানি দেওয়া প্রভৃতি কাজ। অবসর সময়ে বাঙালি নারীরা দল বেধে পাড়া বেড়ায় অথবা পার্শ্ববর্তী কোন বাড়িতে গিয়ে খোস গল্প করে। বাঙালি পরিবারগুলোও পুরুষতান্ত্রিক হওয়ায় পারিবারিক বড় কোনো সিদ্ধান্ত পুরুষরাই গ্রহণ করে। মোট কথা এখানে ভাটিয়া ও বাঙালি পরিবারে নারীদের অবস্থান ক্ষমতাচর্চার দিক দিয়ে অনেক নিচে।

গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য

গোষ্ঠী হচ্ছে একটি জ্ঞাতি দল যার সদস্যগণ তাদের বংশসূত্রীতা পুরুষ পরম্পরা কিংবা নারী পরম্পরার মাধ্যমে নির্ধারণ করে। এটি পূর্বসূরি কেন্দ্রিক। কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে তখনই কাউকে গ্রহণ করা হয় যখন ঐ নির্দিষ্ট পূর্বসূরির সাথে তার যোগসূত্রীতা প্রমাণিত হয়। সুতরাং গোষ্ঠী হচ্ছে একটি যূথ ভিত্তিক দল (ত্রিপুরা : ২০০২)। নৃবিজ্ঞানীদের বক্তব্য হচ্ছে, প্রাচ্যের বহু সমাজে একজন ব্যক্তির রাজনৈতিক বা আইনী অস্তিত্ব এবং মর্যাদা নির্ধারিত হয় গোষ্ঠীর সদস্যপদ দ্বারা। পাশ্চাত্য সমাজে নাগরিকত্বের ধারণা এ গোষ্ঠীর ভূমিকা পালন করে।

প্রবন্ধে ভাটিয়া সমাজে গোষ্ঠীর মধ্যকার বংশ পরম্পরার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাটিয়াদের উপভাষা, এ ভাষার কারণেই তারা একতাবদ্ধ এবং ঐ এলাকার লোকজন বুঝতে পারে কে ভাটিয়া বা কে ভাটিয়া না। এখানে ভাটিয়াদের মধ্যে যদিও কোন রক্তের সম্পর্ক নেই, তবু তারা গোষ্ঠীর মত যূথবদ্ধ হয়ে বসবাস করছে। এখানে ভাটিয়া পাড়ার মধ্যে অর্ন্তভুক্ত ঢাকাইয়া পাড়ায় ঢাকাইয়ারা, কলোনী পাড়ায় টাংগাইল ও ময়মনসিংহের লোক, ধলা ছেড়ি পাড়ায় মানিকগঞ্জ ও টাংগাইলের লোকজন পাশাপাশি বসবাস করে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা লোকদের একত্রে বাস করার কারণে ভিন্ন ভিন্ন পাড়ার সৃষ্টি বা নামকরণ হয়েছে। এখানে যূথবদ্ধতা রয়েছে ভাষার কারণে। কিন্তু এ যূথবদ্ধতা তাদের আইনী অস্তিত্বকে যদিও নিশ্চিত করে না কিন্তু তাদের রাজনৈতিক (দলাদলির, গ্রুপিংয়ের) অস্তিত্বকে নিশ্চিত করে। এ এলাকায় কোন ভাটিয়া ব্যক্তির সাথে যদি কোন বাঙালি ব্যক্তির ঝগড়া লাগে বা কোনো ধরনের সংঘর্ষ হয় তাহলে সেটাকে কেন্দ্র করে গ্রামে দলাদলি শুরু হয়।

ভাটিয়াগণ সবাই ভাটিয়াদের পক্ষ নেয় আর বাঙালিরা সবাই বাঙালিদের পক্ষ নেয়। এ গোষ্ঠীগত দলাদলির চর্চা ব্যাপকভাবে চলতে থাকে।

২০১১ সালের ১২ই মার্চ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের সময় আকাশকুড়ী গ্রামের ২নং ওয়ার্ডের একজন ভাটিয়া ব্যক্তি মেম্বার পদে নির্বাচন করেন। এলাকার সকল ভাটিয়াদের সম্মতিতে এ ভাটিয়া ব্যক্তিকে নির্বাচনে মেম্বার পদ প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি নির্বাচিত হতে পারেননি। তবে এলাকার প্রায় সকল ভাটিয়া ভোটার তাকে ভোট দিয়েছিলেন। এর আগের নির্বাচনে ২নং ওয়ার্ডের মেম্বার একজন ভাটিয়া ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও ঐ ভাটিয়া জনগোষ্ঠীর সমর্থন পেয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ভাটিয়াগণ মনে করেন যদিও তাদের মধ্যে কোন ধরনের রক্তের সম্পর্ক নেই তবুও তারা অন্যান্য ভাটিয়াদের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তথ্যদাতা ফজলুল হক বলেন, "ভাটিয়ারা সবাই সাকাই।" এর অর্থ হল ভাটিয়ারা সবাই একে অপরের আত্মীয়।

জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বসবাসের ধরন

আকাশকুড়ী গ্রামের বাঙালিরাও ভাটিয়াদের মত যূথবদ্ধ হয়ে কাজ করে। একই পাড়ায় একই বংশীয় লোকজন পাশাপাশি বাড়িঘর তৈরি করে বসবাস করার কারণে এখানে পাড়া তৈরি হয়েছে। এখানে স্থানীয় রাজনীতিতে এ যূথবদ্ধতার প্রভাব প্রতীয়মান হয়েছে। আকাশকুড়ী গ্রামের ১নং ওয়ার্ডের মেম্বার একজন বাঙালি ব্যক্তি তাকে প্রায় অধিকাংশ বাঙালি ভোট দিয়েছে। তবে বাঙালিরা কোনো সমস্যায় পড়লে তারা ভাটিয়াদের মত এরকম যূথবদ্ধ হয়ে কাজ করে না। তাদের মধ্যে ভাষাগত টানের চাইতে গোষ্ঠীগত টান অনেক বেশি কাজ করে।

বাড়িঘরের বিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এখানকার বাঙালিরা সবাই একই সাথে পাশাপাশি বাড়ি তৈরি করে বসবাস করছে। পিতা মাতা এবং অন্যান্য বংশধরের সাথে একই জায়গায় বসবাস করার প্রবণতার কারণে নিজ আত্মীয়-স্বজনের বাড়ির আশেপাশে বাড়িঘর তৈরির কারণে বাঙালি বাড়িগুলো ঘিঞ্জি আকারে গড়ে উঠেছে আর সবগুলো বাড়ি মিলে পাড়া তৈরি করেছে। আমাদের গবেষণা এলাকায় ৩টি বাঙালি পাড়া রয়েছে। এগুলো হল - চিলাখাল পাড়া, শুটি পাড়া ও কানা পাড়া। বাঙালি পাড়াগুলোতে শুধু বাঙারি কমিউনিটির লোকজনের বসবাস। পাশাপাশি আকাশকুড়ী গ্রামের ভাটিয়াদের বাড়িঘরের বিন্যাস লক্ষ করলে দেখা দেখা যায় যে, যেখানে ভাটিয়াদের বাড়ি সেখানে শুধু তাদের বাড়িই। বংশ পরম্পরায় এবং আত্মীয়দের কাছাকাছি বসবাস করার প্রবণতার কারণে এ বাড়িগুলো কাছাকাছি গড়ে উঠেছে। আকাশকুড়ী গ্রামে ঢাকাইয়া পাড়া, পুব পাড়া, ডাঙ্গা পাড়া, ধলা ছেড়ি পাড়া, কলোনী পাড়া নামক এই পাঁচটি ভাটিয়া পাড়া আছে। এখানে ঢাকাইয়া পাড়ায় ঢাকা অঞ্চলের অভিবাসীগণ একত্রে বসবাস করার কারণে এটি ঢাকাইয়াপাড়া নামে পরিচিত। ঢাকাইয়ারা নাউতারা নদীর (এ গ্রামের স্থানীয় একটি নদী, যেটি এ গ্রামের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে) দক্ষিণ পাশে বসবাস করে। এখানে এক নাগারে ৫০টি বাড়ি ঘিঞ্জি আকারে গড়ে উঠেছে। ময়মনসিংহ ও টাংগাইলের অভিবাসীরা নদীর উত্তরপাশে কলোনী পাড়ায় বসবাস করে। এখানে একনাগারে কিছু বাড়িঘর এবং মাঝে মাঝে কিছু ফাকা স্থানও বিদ্যমান। এ কলোনী পাড়ায় ৪টি ঢাকাইয়া বাড়ি রয়েছে, তারা জমি কিনে এখানে আবাস স্থল তৈরি করেছে। ঢাকাইয়াদের ভাষায়, *"আমরা কষ্ট কইরা এইহানে জমি কিনা বাড়ি করছি। ময়মনসিংগারা তেমুন বালো না তারা আমাগো দ্যাকপার পারে না।"*

ধলাছেড়ি পাড়ায় টাংগাইলের ও মানিকগঞ্জের অভিবাসীরা বসবাস করেন। পুবপাড়ায় টাংগাইল ও ময়মনসিংহের অভিবাসীরা বসবাস করেন। ডাঙ্গা পাড়ায় টাংগাইল ও মানিকগঞ্জের অভিবাসীদের বসবাস। সম্মিলিতভাবে এরা সবাই আকাশকুড়ী গ্রামের স্থানীয়দের কাছে ভাটিয়া হিসেবে পরিচিত।

ব্যবহৃত জ্ঞাতিপদাবলীতে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক সত্যের সামাজিক নির্মাণ। জ্ঞাতিত্ব একই সাথে প্রাকৃতিক বা জৈবিক এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণ। গবেষণা এলাকায় তিন ধরনের জ্ঞাতি ব্যবস্থা রয়েছে যথা- রক্ত সম্পর্কের জ্ঞাতি, বিবাহসূত্রীয় জ্ঞাতি এবং পাতানো জ্ঞাতিসম্পর্ক। এ এলাকায় পিতৃতান্ত্রিক মুসলিম সমাজব্যবস্থা থাকায় এখানে ভাটিয়া ও বাঙালিদের জ্ঞাতিসম্পর্কের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য দেখতে পাইনি। তবে জ্ঞাতি পদাবলি উচ্চারণে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যগুলো হল- বাঙালি কমিউনিটির সদস্যগণ বড় চাচাকে বলেন বড়বা/ বড় আব্বা, বড় চাচীকে বলেন বড়মা/বড়আম্মা, ছোট চাচাকে বলেন ছোটবা/ ছোট আব্বা, ছোট চাচীকে বলেন ছোটমা/ ছোট আম্মা।

ভাটিয়ারা কমিউনিটির সদস্যগণ বড় চাচাকে বলেন বড় কাক্কু/ বড়কাক্কা, বড় চাচীকে বলেন বড় চাচী, ছোট চাচাকে বলেন ছোট কাক্কু/ ছোট কাক্কা। ছোট চাচীকে ছোট চাচী বলেই সম্বোধন করেন।

বাঙালি কমিউনিটির সদস্যগণ প্রো-পিতামহকে 'বড়বা' এবং প্রো-মাতামহকে বলেন 'বড়মা'। ভাটিয়াগণ 'তাউই' এবং 'মাউই' বলে সম্বোধন করেন।

ভাটিয়া ও বাঙালি কমিউনিটিতে বিবাহ সম্পর্কিত জ্ঞাতি পদাবলীতেও কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যথা- বাঙালিরা স্ত্রীর বাবা-মা কে শ্বশুর-শাশুড়ি কিন্তু স্ত্রীর বড় ভাইকে 'বড়শালা' স্ত্রীর বোনের স্বামীকে 'সালপইত' বলে সম্বোধন করেন। ভাটিয়াদের মধ্যে স্ত্রীর বাবা-মা কে হশুর- হাশুরি, স্ত্রীর বড় ভাইকে 'হুমুন্ধি', স্ত্রীর বোনের স্বামীকে 'ভায়রা' বলে সম্বোধন করে থাকেন।

এছাড়াও ভাটিয়া ও বাঙালি কমিউনিটিতে পাতানো সম্পর্কও রয়েছে। কারো বিয়ের সময় বিয়ে পড়ানোতে যারা সাক্ষী হিসেবে থাকেন তাদের মধ্য থেকেই একজন 'পুরুষ' সাধারণত উকিল দিয়ে থাকে। উকিল দেওয়ার পর ঐ পুরুষ ব্যক্তিটি কন্যার পাতানো বাপ বা উকিল বাপ হিসেবে বিবেচিত হন। এসর্ম্পকের উপর ভিত্তি করে বর কনে তাদের উকিল শ্বশুর বাড়িতে 'নাইয়র' (ভাটিয়া উপভাষায় স্ত্রী বাপের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়াকে নাইয়র বলে) যায়।

পূর্বে এ এলাকায় ভাটিয়া ও বাঙালি উভয় কমিউনিটিতেই প্রিয় ব্যক্তিটির সাথে (সম বয়সী পুরুষ- পুরুষ অথবা নারী-নারী) ছেলেদের ক্ষেত্রে 'দোস্ত' এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে 'সই' নামক সম্পর্ক পাতানোর প্রচলন ছিল কিন্তু বর্তমানে এ প্রথাটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

জ্ঞাতিসম্পর্ক এ এলাকায় একটি বিরাট রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এলাকায় যার জ্ঞাতি সর্ম্পকীয় লোকজন বেশি তার আধিপত্যও বেশি। এ ধরনের প্রভাব আমি ঢাকাইয়া পাড়ায় দেখেছি। এ জ্ঞাতি সম্পর্কের কারণে তারা এলাকার অন্য ভাটিয়াদের উপর প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা করে।

আকাশকুড়ী গ্রামে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনেক ছোট ছোট সংগঠন আছে। সংগঠনের মধ্যে ভাটিয়াদের সমিতি, ভাটিয়াদের মসজিদ ভিত্তিক সংগঠন ও বাঙালিদের মসজিদ ভিত্তিক সংগঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাটিয়াদের মধ্যে যে সমিতিগুলো আছে সেগুলোর সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২০ জন করে। আকাশকুড়ী গ্রামের ঢাকাইয়া পাড়ায় আব্দুর রশিদের (৪৫) বাড়িতে একটি সমিতি আছে এর সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। প্রতিটি সদস্য সপ্তাহে ১০ টাকা করে কিস্তি দেয়। এতে যে সঞ্চয় হয় তা থেকে এলাকার গরিব লোকজকে নির্দিষ্ট সুদে ঋণ দেওয়া হয়। এ সমিতি থেকে বাঙালি, ভাটিয়া, এবং গবেষণা এলাকার বাইরেও হিন্দু বাঙালিরাও ঋণ নিয়ে থাকে।

ধলাছেড়ি পাড়ায় একটি সমিতি আছে এর সদস্য সংখ্যা ২০ জন। এ সমিতির সদস্যরা সবাই ভাটিয়া। ঋণ দেওয়া ও কিস্তি তোলার প্রক্রিয়াটিও উপরোক্ত সমিতির মতই। একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষনীয় সেটি হল এ সমিতিতে কোন উপযুক্ত নারী সদস্য নেই।

আকাশকুড়ী গ্রামে কলোনী পাড়ার মাঝখানে একটি মসজিদ আছে। এ মসজিদকে কেন্দ্র করে এক ধরনের সংগঠন গড়ে উঠেছে। ভাটিয়ারা এ সংগঠনকে মসজিদ ভিত্তিক সমাজ বলে অভিহিত

করেন। মসজিদ ভিত্তিক এ সমাজের/সংগঠনের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৬০টি পরিবার। এদের মধ্যে ২৫টি পরিবার বাঙালি বাকি ৩৩৫টি পরিবার ভাটিয়া। এ সমাজে ঢাকাইয়া পাড়া, ধলাছেড়ি পাড়া, পুব পাড়া, কলোনী পাড়া ও কানা পাড়ার লোকজন সদস্য হিসেবে আছেন। প্রতিটি সদস্য পরিবারের কাছ থেকে সপ্তাহে একদিন প্রতি বৃহস্পতিবার তাদের জমানো মুষ্ঠির চাল থেকে একপোয়া করে চাউল সংগ্রহ করে এ মসজিদের কোষাগারে জমা রাখার হয়। এ জমানো চাউল বিক্রি করে মসজিদের এবং ঈদগাহ মাঠের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা হয়। মসজিদ ভিত্তিক এ সমাজে একজন সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ রয়েছেন নেতৃস্থানীয় এ তিনজনই ভাটিয়া কমিউনিটির সদস্য। তারা এ সমাজের যাবতীয় কাজগুলো তদারকি করেন। আশেপাশের গ্রামের স্থানীয় লোকজন এ সমাজকে ভাটিয়া সমাজ বলে অভিহিত করে থাকেন।

বাঙালি কমিউনিটির মাঝে এ রকম কিস্তি তোলা ও ঋণ দেয়ার মত সমিতি নেই। তবে তাদের মধ্যে শুটিপাড়ায় একটি চিলাখাল পাড়ায় দুইটি মসজিদ আছে। শুটিপাড়ায় এ মসজিদ ভিত্তিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৬০টি। তাদের মধ্যে সামাজিক সংহতি অনেক দৃঢ়। এ মসজিদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও এর অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা সমাজের সকল সদস্য পরিবারের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে করা হয়। তাদের এ মসজিদ ভিত্তিক সমাজ গঠনের পেছনে যে ঘটনাটি অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে তা হল - প্রায় ২০০৬ সালে ৪০টি পরিবার পার্শ্ববর্তী ভাটিয়া সমাজের সদস্য ছিল। কিন্তু এদের একজন ভাটিয়া মসজিদের ইমাম সাহেবকে গালিগালাজ করায় সমাজের অন্যান্য সদস্যরা এ বাঙালি পরিবারগুলোকে তাদের সমাজ থেকে আলাদা করে দেয়। তাই তারা নিজেরাই অন্য ২০টি পরিবারের সাথে একটি আলাদা সমাজ গঠন করে এবং নামাজ পড়ার জন্য একটি মসজিদ তৈরি করে। এ মসজিদের উন্নয়নের জন্য প্রতি সপ্তাহে মসজিদের মুয়াজ্জিন একবার করে প্রতিটি সদস্য পরিবারের কাছ থেকে তাদের জমানো মুষ্ঠির চাল সংগ্রহ করেন।

আকাশকুড়ী গ্রামে কোন নিবন্ধনকৃত সমিতি বা সংগঠন নেই। উপরের এ বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভাটিয়াদের মধ্যে টান বেশি থাকায় তারা নিজেরা একত্রে একটি মসজিদ ভিত্তিক সমাজ গঠন করেছে। আবার

আকাশকুড়ী গ্রামে একটি কেন্দ্রীয় ছোট হাট আছে। হাটটির নাম গাছবাড়ির হাট। সপ্তাহে বৃহস্পতি ও সোমবার হাট বসে। সেখানে ১২টি ভাটিয়াদের দোকান এবং ৫৫টি স্থানীয় বা বাঙালিদের দোকান আছে। গ্রামের স্থানীয় লোকজন ঐ ৫৫টি বাঙালি দোকানে কেনাকাটা করে তবে এসব দোকানে যদি তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য না পায় তবে তখন তারা ঐ ভাটিয়া লোক দোকান গুলোতে ঐ প্রয়োজনীয় দ্রব্য অনুসন্ধান করার জন্য যায়। সম্প্রতি আকাশকড়ি গ্রামের মাঝখানে বটতলা বাজার নামে একটি বাজার গড়ে উঠেছে। এ বাজারে মোট ৪০ টি দোকান রয়েছে। এর মধ্যে ১ টি দোকান স্থানীয় হিন্দু লোকের। বাকি ৩৯টি ভাটিয়া লোকজনের। ভাটিয়া কমিউনিটির সদস্যগণ এখন তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এ বটতলা বাজার থেকে কেনা-কাটা করেন। এখানে বাঙালি কমিউনিটির লোকজনও বাজার সদাই করতে আসেন। এ বাজারটি এখন এ গ্রামে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ধর্ম, পোশাক এবং ভাষা

বাঙালি বা স্থানীয় নারীদের বর্তমান প্রচলিত প্রধান পোশাক হল শাড়ী। পূর্বে বাঙালি নারীরা ছাট পরতো (ছাট হল বুক থেকে পা পর্যন্ত লম্বা একটি পোশাক যা বুকের মধ্যে ফিতা দিয়ে বাধা থাকে)। কিন্তু বর্তমানে তারা শাড়ী, ব্লাউজ, ওড়না পরে। বিবাহিত নারীরা বিয়ের পর নাকফুল, মালা, কানের দুল, হাতে চুড়ি পরে। অবিবাহিত মেয়েরা সালোয়ার, কামিজ, ফ্রক পরিধান করে, কানে দুল, হাতে চুড়ি পরে। বাঙালি পুরুষরা পূর্বে নেংটি পরতো, কেউ ধুতি, কেউ কেউ ফোতা পরতো (ফোতা হল

সেলাই ছাড়া একপ্রকার লুঙ্গি। এখন তারা লুঙ্গী, শার্ট, পাঞ্জাবি পড়ে। শিক্ষিত বাঙালি পুরুষরা ফুলপ্যান্ট, শার্ট পরে।

পোশাকের ক্ষেত্রে এখানকার ভাটিয়া বিবাহিত নারীরা শাড়ী পওে, পূর্বেও তারা শাড়ী পরতো। বিবাহিত নারীরা বিয়ের পর নাকফুল, নাকে লম্বা নোলক পরে (ভাটিয়া ভাষায় একে পালিসপাত বলে) মালা, কানের দুল, হাতে চুড়ি ও কোমরে এক প্রকার মোটা মালা পরে। অবিবাহিত নারীরা সালোয়ার, কামিজ, ফ্রক ও ওড়না, কানের দুল, হাতে চুড়ি পরে। ভাটিয়া নারীরা অনেক বেশি পর্দাশীল। পূর্বে তারা কোন আত্মীয়ের বাসায় গেলে বেশিরভাগ নারী কালো বোরখা পরিধান করে যেত। এখনকার নারীরা খুব কম বোরখা ব্যবহার করে। তাদের এ পরিবর্তনের পেছনে অনেকে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এলাকার বয়োজেষ্ঠ্য লোকজনের ধারনা বর্তমানকার শিক্ষা নারীদের আরও বেশি বেপর্দা করে দিয়েছে। অনেকে দাবী করেন এন.জি.ও-র কারণেও নারীরা বেপর্দা হচ্ছে। তথ্যদাতা আবু হোসেনের(৬৫) ভাষায়, "এন.জি.ও-রা এই দ্যাশের মহিলাগো বাড়ির বাইরে নিয়া আইছে, এন.জি.ও গো কারণে মহিলাগো সাহস বাড়ছে তবে একটা খারাপ কাজ করছে, হেইডা অইল এন.জি.ও-র কারণে মহিলারা বেপর্দা বেশি অইছে।" ভাটিয়া পুরুষরা সাধারণত লুঙ্গি, শার্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি, পাঞ্জাবি পরে। অন্যান্যদের সাথে এদের পোশাকের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির লোকের বসবাস, এ এলাকার সবাই মুসলিম। এখানে রয়েছে শ্রেণি ভিত্তিক কৃষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন পেশার লোক। এ এলাকায় ভাটিয়া ও বাঙালিদের বিবাহরীতি, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, স্বজনদের মধ্যকার পরস্পর সম্পর্ক, মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়াবলি ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বিভিন্ন সামাজিক বিষয়াবলি যা পেশা, শ্রেণি ও লিঙ্গ অনুযায়ী আলাদা হয়। এগুলো আবার উপভাষায় ব্যবহৃত পৃথক পৃথক রূপমূলের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এখানে উভয় কমিউনিটির ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য পাশাপাশি উপস্থাপন হল। যেমন- ভাটিয়াদের মধ্যে ব্যবহারিক শব্দগুলো হলো বাড়ি, গর, রান্দুনগর, ডোল (ধান রাখার বাশের বড় খাচা), আইস্যাল, চুলা, কাচি, পাইলা, তইলা, রাইং সুকেছ ইত্যাদি। আর বাঙালিদের (স্থানীয়) মধ্যে ব্যবহারিক শব্দগুলো হলো- বাড়ি, ঘর, আন্দন ঘর, শোয়ার ঘর, ডুলি, চুল্যা, কাইচ্যাও, পাতিল, বগিণ্যা, শোকেছ ইত্যাদি।

এছাড়াও সম্বোধনসূচক শব্দ যেগুলো আত্মীয় বা জ্ঞাতিসম্পর্কের লোকদের ক্ষেত্রে যেসব পদাবলি দ্বারা সম্বোধন করা হয়। যেমসন- ভাটিয়াদের মধ্যে ব্যবহারিক রূপমূলগুলো হলো- মা, বাবা, বাজান, আব্বাজান, বাই-ভাই, গেদা, পুলা, ফুব্যা, বায়রা, হালা, হালী, হুমুন্দি ইত্যাদি। এছাড়া বাঙালিদের (স্থানীয়) মধ্যে ব্যবহারিক রূপমূলগুলো হলো- এা, বাবা, আব্বা, ভাইয়্যা, বুজান, বাউ, ব্যাটা, মাই, বেটি, ফুপু, ভুপা, সালপোইত, শালা, শালী, সমন্ধি, বড় শালা ইত্যাদি।

আবার খাওয়া দাওয়া সম্পর্কিত শব্দের রূপমূল এর ক্ষেত্রেও দেখা যায় ভিন্নতা যেমন- ভাটিয়াদের মধ্যে ব্যবহারিক রূপমূলগুলো হলো- বাত, সালুন, (তরকারি), চুকা, কুস্যাল, বাহা পিঠা, নসুন (রসুন), তেল পিঠা ইত্যাদি। আবার বাঙালিদের (স্থানীয়) মধ্যে ব্যবহারিক রূপমূলগুলো হলো- ভাত, তকাই, ট্যাংগ্যা, কুসার, ভাকা পিঠা, আসুন, পুয়া পিঠা ইত্যাদি।

যোগাযোগ

ভাটিয়াদের মধ্যে কোন ভাটিয়া ব্যক্তি যদি কারো বাড়িতে কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, তাহলে বাড়ির কর্তার(পুরুষতান্ত্রিক) ছেলের সাথে বা মেয়ের সাথে দেখা হলে বলেন, "গেদা/গেদি তোমার বাপে বাইত্তে আছে নাকি?" যদি তার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ হয় তাহলে বলেন, "আপনেগো দেওয়ানী বাইত্তে আছে না*?*" যদি বাড়ির বাইরে কারও দেখা না পান তাহলে তার সাথে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক ধরে ডাক দেন যেমন-*মজিদ বাই বাইত্তে আছ?* তবে ভাটিয়ারা সাধারণত তাদের নিজ উপভাষায় কথা বলে। বাঙালিদের সাথে কথা বললে বাঙালি উপভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে।

স্থানীয়দের মধ্যে কোন স্থানীয় ব্যক্তি যদি কারো বাড়িতে কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় তাহলে যদি বাড়ির কর্তার(পুরুষতান্ত্রিক) ছেলের সাথে বা মেয়ের সাথে দেখা হলে বলেন- "বাউ/মাই তোর বাপ বাড়িত আচে নাকি?" যদি তার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ হয় তাহলে বলেন- "হা বায় তোমার দোয়ানী বাড়িত আচে?" যদি বাড়ির বাইরে কারো দেখা না পান তাহলে তার সাথে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক ধরে ডাক দেন যেমন-হা বায় হারুন বাড়িত আচিস? বয়সে বড় হলে বলেন, "হাবায় চাজি/ মামা/ ভাইয়া বাড়িত আচেন?" তবে স্থানীয়রা সাধারণত তাদের নিজ উপভাষায় কথা বলে। ভাটিয়াদের সাথে কথা বললে ভাটিয়া উপভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে।

শব্দ ব্যবহারে পার্থক্য

ভাটিয়াদের মধ্যে নারী ও পুরুষের কিছু কিছু শব্দ ব্যবহারে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কিছু কিছু শব্দ নারীরা বেশি ব্যবহার করে, যেমন-নারীরা সাধরণত কথায় কথায় 'ধ্যুৎতারিকা', 'দুরুজা' কথার শেষে বা শব্দের শেষে 'লো','গো' প্রভৃতি ব্যবহার করেন বেশি। যেমন কোন ঘটনা জিজ্ঞাসা করতে একজন নারী যখন অন্য আর একজন নারীর সাথে কথা বলেন তখন, " কি অইছেলো ঐহানে?","বু লো তুই কনে গেছিলি লো?" এরকম 'লো' প্রত্যয় যুক্তশব্দ ও বাক্য ব্যবহার করে। আবার কোন পুরুষের সাথে কোনো মহিলা কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলেন- "ওনে কি অইছে গো?" কিছু কিছু শব্দ নারীরা ব্যবহার করে না। এক্ষেত্রে কিছু কিছু ভাষা ব্যবহারে ট্যাবু কাজ করে, যেমন- তারা তাদের স্বামীর নাম, স্বামীর বড় ভাইয়ের নাম, স্বামীর বাবার নাম বলে না। এক্ষেত্রে তারা পরোক্ষভাবে নাম বলার চেষ্টা করে। তাদেরকে সম্বোধন করতে গেলে তাদের (যারা সম্বোধন করবে) সন্তানদের নাম যুক্ত করে সম্বোধন করে যেমন- সজীবের বড় কাকা বা বড় মিয়া, টুম্পার বাপ প্রভৃতি। গবেষণা চলাকালীন জবিতন (৪৫) তার স্বামীকে ডেকেছিল- "কনে গেলা সজীবের বাপ আপনেরে একজন ডাহে।" এছাড়াও নারীরা তাদের স্বামীকে খোজার সময় 'কনে গেলাইন' 'হুনছুইন' (ময়মনসিংহের, টাংগাইলের, মানিকগঞ্জের অভিবাসীরা এ ভাষা ব্যবহার করে) বলে সম্বোধন করে ডাকে।

বাঙালিদের মধ্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছু কিছু শব্দ ব্যবহারে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কিছু কিছু শব্দ নারীরা বেশি ব্যবহার করে, যেমন-নারীরা বাক্যের শেষে বা শব্দের শেষে 'হে', কোনো বোন সম্বন্ধীয় নারীকে স্বম্বোধন করলে সর্বপ্রথম 'হাগে' শব্দ ব্যবহার করেন বেশি। যেমন কোনো ঘটনা জিজ্ঞাসা করতে একজন নারী যখন অন্য আর একজন নারীর সাথে কথা বলেন তখন," হাগে বুজান ঐটে কি হইচে?"," হাগে বুজান তোমা কোনটেকেনা গেচিলেন?"। আবার কোনো পুরুষের সাথে কোনো মহিলা কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলেন, "ওটে কি হইচে বায়?" কিছু কিছু শব্দ নারীরা ব্যবহার করে না। এক্ষেত্রে কিছু কিছু ভাষা ব্যবহারে ট্যাবু কাজ করে, যেমন- তারা তাদের স্বামীর নাম, স্বামীর বড় ভাইয়ের নাম, স্বামীর বাবার নাম বলে না। এক্ষেত্রে তারা পরোক্ষভাবে নাম বলার চেষ্টা করে। তাদেরকে সম্বোধন করতে গেলে তাদের (যারা সম্বোধন করবে) সন্তানদের নাম যুক্ত করে সম্বোধন করে যেমন- করিমের বড়বা বা বড় চাজি, জসিমের বাপ প্রভৃতি। যেমন- "কুত্তি গেইলেন সজীবের বাপ তোমাক কায়বা (কে যেন) ডাকায়।" এছাড়াও নারীরা তাদের স্বামীকে খোজার সময় 'কুত্তি গেইলেন' 'শুইনচেন' বলে সম্বোধন করে ডাকে। সাধারণত স্ত্রীগণ তাদের চাইতে তাদের স্বামী, ভাসুর, শ্বশুর বয়সে বড় হওয়ায় তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে এ ধরনের পদাবলি ব্যবহার করেন। অশিক্ষিত নারীরা, স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন এমন কি শিক্ষিত নারীরাও তাদের স্বামীর নাম বলতে চায় না।

ফ্রেডরিখ বার্থ তার Ethnic Groups and Bounderies (1969, 9-38) নামক গ্রন্থে দেখান কীভাবে এথনিক দলগুলো নিজেদের পরিচিতিকে ধরে রাখছে। এখানে তিনি কোন ভৌগোলিক সীমানা চিহ্নিত করেননি। তিনি এর অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে এবং তাদের চর্চাকে তাদের পরিচিতির

স্বতন্ত্রতার জন্য দায়ী করেন। এ গবেষণায় দুইটি উপভাষিক জনগোষ্ঠী যদিও তারা আলাদা কোন এথনিক কমিউনিটি নয়, তবুও তারা নিজেদের কিছু প্রতিষ্ঠান, নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং নিজেদের কিছু চর্চার কারণে পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে টিকে রয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান ফারাক সৃষ্টিকারী বিষয়টি হল কমিউনিটি দুইটির ব্যবহৃত উপভাষা। এ উপভাষার কারণেই বোঝা যায় কে ভাটিয়া কমিউনিটির এবং কে বাঙালি কমিউনিটির সদস্য। এ উপভাষা দুইটির কিছু কিছু শব্দ উভয় কমিউনিটির লোকজন ব্যবহার করেন। কিন্তু এদের মধ্যে প্রধান পার্থক্যটি হল উচ্চারণ ভঙ্গি এবং গলার স্বরের ওঠানামা। এক্ষেত্রে একজন বাঙালি ব্যক্তি যদি ভাটিয়া ভাষায় কথা বলে তাহলে তার গলার স্বর ও উচ্চারণে বাঙালি উচ্চারণের ছাপ থেকে যায়। ভাটিয়াদের ক্ষেত্রেও একই বিষয় লক্ষণীয় তারা যদি বাঙালি ভাষায় কথা বলে তাহলে তাদের উচ্চারণে এবং গলার স্বরে ভাটিয়া উচ্চারণের ছাপ থাকে।

উপভাষার পাশাপাশি ভাটিয়া ও বাঙালিদের মধ্যে জ্ঞাতিসম্পর্কের কিছু পদাবলিতে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন স্ত্রীর বোনের স্বামীকে ভাটিয়ারা বলে 'ভায়রা' বাঙালিরা বলে 'সালপইত', বড় চাচাকে বাঙালিরা বলে বড়বা/বড় আব্বা এবং ভাটিয়ারা বলেন বড়কাক্কা/বড় কাক্কু।

ভাটিয়া ও বাঙালিদের জীবন চক্রের একটি স্তর বিয়েতে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। এখানে বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে নিজ কমিউনিটির লোকজনই বেশি প্রাধান্য পায়। দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করার পরও খুব কম পরিমানে ভাটিয়া ও বাঙালিদের মধ্যে বিয়ে হয়েছে।

প্রথম দিকে ভাটিয়া ও বাঙালিদের মধ্যে খাদ্যাভাসে তফাৎ ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করার পরেও তাদের মধ্যে যোগাযোগের কারণে তাদের খাওয়া-দাওয়ার ধরনে পরিবর্তন এসেছে। এখন ভাটিয়া ও বাঙালিদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য লক্ষ করা যায় না।

ভাটিয়া ও বাঙালিদের বাড়ি ঘরের বিন্যাসে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে ভাটিয়া পাড়াগুলোর মধ্যে ধলাছেড়ি পাড়া, ঢাকাইয়া পাড়া, কলোনী পাড়া এবং পুব পাড়ায় ভাটিয়ারা যূথবদ্ধ হয়ে বসবাস করার কারণে পাড়া তৈরি হয়েছে। পাড়াগুলোর বিন্যাস ভাটিয়াদের মধ্যকার সম্পর্ককে উন্মোচন করেছে। কানা পাড়া, শুটিপাড়া, চিলাখাল পাড়াতেও বাঙালিরা পাশাপাশি ঘিঞ্জিভাবে বাড়িঘর তৈরির কারণে বাঙালি পাড়াগুলো তৈরি হয়েছে। এখানে বাড়িঘরের বিন্যাস বা পাড়ার ধরন বাঙালিদের মধ্যকার সম্পর্ককে উন্মোচন করে।

মজার বিষয় হল এখানে ভাটিয়া পাড়াগুলোর মধ্যে শুধু পুব পাড়াতে একটি মাত্র বাঙালি পরিবারের বসবাস রয়েছে। বাঙালি পাড়াগুলোতে কোন ভাটিয়া পরিবারের বসবাস নেই। ভাটিয়া ও বাঙালিদের মধ্যকার সম্পর্ক আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের সময়। এ নির্বাচনে ভাটিয়ারা তাদের মধ্য থেকে একজন ভাটিয়া প্রার্থীকে দাঁড় করিয়েছিলেন। ভাটিয়ারা সবাই এ প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলেন। বাঙালিরাও তাদের মনোনীত বাঙালি প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলেন। ভাটিয়া ও বাঙালিদের মধ্যে পূর্বে পোশাকের ধরনে পার্থক্য ছিল। কিন্তু এখন কোন পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। কমিউনিটি দুইটির আন্তঃ প্রভাবের কারণে এর পরিবর্তন হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে ভাটিয়াদের মধ্যে যৌথ পরিবার বেশি বাঙালিদের মধ্যে অনু পরিবার বেশি। ভাটিয়ারা তাদের সমিতির কারণেও বাঙালিদের থেকে আলাদা।

উপসংহার

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, একটি উপভাষিক অঞ্চলে বাইরে থেকে অন্য আর একটি উপভাষিক কমিউনিটি অভিবাসিত হয়ে আসলে কিংবা পাশাপাশি একাধিক উপভাষিক কমিউনিটি

দীর্ঘদিন বসবাস করার পরও তাদের মধ্যে উপভাষাগত পার্থক্যের পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়াবলির মধ্যে কিছু কিছু ট্রেইটের যেমন- যুধবদ্ধতা, খাওয়া দাওয়ার ধরন, কমিউনিটিতে দলাদলি, স্থানীয় হাটবাজারে তাদের কেনাকাটার ধরন, বিয়ের অনুষ্ঠানের রীতিনীতি প্রভৃতির বিনিময় হয়নি। এ প্রায় অবিনিময়কৃত ট্রেইটের কারণে পাশাপাশি বসবাসরত একাধিক উপভাষিক জনগোষ্ঠীগুলো তাদের স্বতন্ত্র অবস্থান এবং পরিচিতি নিয়ে টিকে থাকতে পারে। এ ট্রেইটগুলোর ভিন্নতার কারণেই তাদের মধ্যে সম্পর্কের নৈকট্য ও দূরত্ব তৈরি হয়।

প্রবন্ধে ভাটিয়া ও বাঙালি উপভাষিক কমিউনিটি দুইটির মধ্যে আরও যে বিষয়গুলোতে পার্থক্য লক্ষ করেছি সেগুলো হল- বিয়ে ব্যবস্থা, নিজ কমিউনিটিতে ভাষার কারণে যূথবদ্ধতা, তাদের চর্চিত কিছু ধর্মীয় বিষয়, কমিউনিটি দুইটির অভ্যন্তরীণ কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যেমন- জ্ঞাতিব্যবস্থা ও জ্ঞাতিপদাবলির ধরন, ভাটিয়া কমিউনিটির লোকজনের প্রতি বাঙালি কমিউনিটির লোকজনের মনোভাব প্রভৃতি বিষয়। এ বিষয়গুলোকে তাদের কমিউনিটির প্রেক্ষিতে স্থান কাল পাত্র ভেদে স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করলে কমিউনিটি দুইটির মধ্যকার সম্পর্কেও নৈকট্য ও দূরত্বকে অনুধাবন করা যায়। গবেষিত এলাকায় ভাটিয়া ও বাঙালি কমিউনিটির মধ্যকার সম্পর্ককে বাইরে থেকে স্বল্প সময়ব্যাপী পর্যবেক্ষণ করলে তাতে তাদের উপভাষা ব্যতিত আর কোনো পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হবে না। কিন্তু দীর্ঘ সময়ব্যাপ্তি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে সম্পাদিত কর্মকাণ্ড যেমন- বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে ভাটিয়ারা নিজ কমিউনিটির সদস্যদের বেশি প্রাধান্য দেয় এ পার্থক্যও দৃষ্টিগোচর হবে। এ পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমিতার কারণ তাদের মধ্যে জ্ঞাতি সম্পর্কের সদস্যদের মধ্যে বেশি বিয়ে হয়। তাদের মধ্যে গোষ্ঠী/কমিউনিটির বিশুদ্ধতা রক্ষা করার মতাদর্শ প্রচলিত। এর পাশাপাশি বাঙালিদের আচরণগত পার্থক্যের কারণে ভাটিয়ারা বাঙালিদের সাথে বিবাহের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপনে কম আগ্রহী থাকে। এ মতাদর্শ এবং চর্চা উভয় কমিউনিটির অর্ন্তনিহিত একটি বিষয় যা পর্যবেক্ষণের জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। এ অর্ন্তনিহিত চর্চার কারণে তাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আরও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে।

এসব মতাদর্শ এবং চর্চার কারণে ভাটিয়া ও বাঙালিদের মধ্যে সম্পর্কের নৈকট্য ও দুরত্ব স্থাপিত হয়েছে। এসব মতাদর্শ এবং চর্চাগুলো দীর্ঘ দিন পাশাপাশি লালিত হওয়ার পরও মিশ্রিত হচ্ছে না। আবার কিছু কিছু ট্রেইটের মিশ্রণের ফলে তাদের মধ্যে সম্পর্কের নৈকট্য বেড়ে যায়। যেমন উপভাষার কিছু কিছু শব্দের বিনিময়ের ফলে তারা পরস্পরের ভাষা সহজে বুঝতে পারে এবং পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ সহজ হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের সম্পর্কের ব্যবধান কমে আসে। তাই বলতে চাই উপভাষা ও অভিবাসন কেন্দ্রিক স্থানিক সম্পর্কের নৈকট্য ও দূরত্বকে উপভাষার পাশাপাশি তাদের সমাজ এবং সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ অন্যান্য ট্রেইটগুলোর আলোকে পাঠ করা উচিত।

সহায়ক তথ্যপঞ্জি

Barth, Fredrik (1969), *Ethnic Groups and Boundaries: The Social organization of Cultural Difference,* Norway, Nye Intertrykk as.

(a), Boas, Franz (1940), *Race Language and Culture*, New York: Macmillan.

(b), Boas, Franz (1964), "Linguistics and Ethnology", in Hymes, Dell H. *Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and Anthropology,* New Delhi, Allied Publishers Private Ltd.

Bright, William (1964), "Social Dialect and Language History" in Hymes, Dell H. *Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and Anthropology*, New Delhi, Allied Publishers Private Ltd.

Casson, R.W. (ed.) (1981), *Language, Culture, and Cognition: Anthropological Perspectives,* New York: Macmillan. Pp. ix + 489.

Dozier Edward P. (1964), "Two Examples of Linguistic Acculturation: The Yaqui of Sonora and Arizona and the Tewa of New Mexico" in Hymes, Dell H. *Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and Anthropology*, New Delhi, Allied Publishers Private Ltd.

Keesing, Roger M. (1981), "Theories of Culture", in Casson, R.W. (ed.) *Language, Culture, and Cognition: Anthropological Perspectives,* New York: Macmillan.

Ramisch, Heinrich (1989), *The Variation of English in Guernsey/ Channel Islands*, The University of Califofornia: P. Long. 1989.

Sebeok, Thomas A.(1960), "Folksong Viewed as Code and Message" in Sebeok, Thomas A. (ed.) *Style in Language*, New York . London: The Technology Press of Massachusetts Institute of Technology and John Wiley & sons.

Smith Charlotte Seymour (1986), *Macmillan Dictionary of Anthropology*, Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke

The Century Dictionary (1889), An En-Lexicon of the English Language Vol-4. London: the Janes.

Verma, M.K (1998), *Sociolinguistics Language and Society*, New Delhi: Sage.

মনিরুজ্জামান (১৯৮৫), *ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর (১৯৯৯), *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মহাম্মদ দানীউল হক (১৯৮৪), *ভাষাতত্ত্বের কথা*, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা।

প্রশান্ত ত্রিপুরা, মানস চৌধুরী, রেহনুমা আহমেদ *(২০০২) সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান পরিচিতি*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[**Abstract:** As two different communities' live side by side, some of the cultural elements between them blend into certain characteristics. But some characteristics are not exchanged between the communities even after they have lived for a long time, like as the differences of terminology of dialectal language the community people use and including other social, cultural, political, economic issues. Because of this almost non-interchangeable trait, populations of multiple communities living side-by-side can survive with their distinct positions and identities. Differences in these traits create closeness and distance between them. In our study, we investigated which traits have been exchanged between the two dialect communities due to their long coexistence and which traits still retain their distinctiveness. Two communities namely Bhatia and Bengali live in the studied area. One of the two communities was the immigrant community known as Bhatia who have been living in the study area for more than 60 years alongside the Bengali community (known as Local in the study area). Differences in some words of the language used between the two groups were observed, as well as differences in vocal inflections when pronouncing the same word. Here, controlling for migration characteristics and the dialect used, other characteristics of both communities have been mixed and some characteristics that are still unmixed have been highlighted in this study. Basically, the main topic of this research is to explore the exchange and uniqueness of some traits between two dialect communities living side by side after migration.]

Key Word: Dialectic Language, Culture, Acculturation, Community, Society, Dialectic Language Based Community, Bhatia, Bangali.